দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

০৫

সেই নিদারুণ ভর্তি পরীক্ষা

প্রতিচক্রে আবর্তিত বাংলাদেশ। একইভাবে আবর্তিত সমস্যাচক্রেও। বছরের কিছু কিছু সময় কিছু কিছু সমস্যা নিয়ম করে দেখা দেয়। সেসব সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা হয়, হৈচৈ হয়—তারপর তা থিতিয়ে যায়। পরের বছর নির্দিষ্ট সময়ে ফের তা মাথাচাড়া দেয়। এক বছর নয়, দু বছর নয়—ফি বছরই এমন হয়। ভর্তি সমস্যা এমন সমস্যার মধ্যে একটি। যে কোনও স্তরেই ভর্তি এখন আতংক। কারিগরি, চিকিৎসা, অনার্স থেকে আরম্ভ করে বিদ্যালয় পর্যায়ের যেকোনও শ্রেণীতে ভর্তি এখন হৃদকম্প। যেকোনও ভর্তিই এখন ভর্তি-পরীক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই প্রতিটি পরীক্ষাই কঠোর প্রতিযোগিতার আওতাভুক্ত।

প্রতিযোগিতায় যোগ্যরাও মার খায়। কেননা, সীট সংখ্যা দিয়েই ভর্তি সংখ্যা নির্ধারিত হয়। ফলে মেধাবী ছাত্রদেরও আরাধ্য ক্লাসে ভর্তির জন্য বিপন্ন হতে হয়। ভর্তি এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে এর জন্য অদৃষ্টবাদী না হয়ে যেন আর উপায় নেই।

এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্রদের ভর্তি নিয়ে ভাগ্যখেলা চলছে। চিকিৎসা ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ও তারিখ ঘোষণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এখনও নীরব রয়েছেন। যে পরীক্ষা হয়ে গেছে অথবা যে পরীক্ষা শীগগীর হবে কিংবা যার তারিখ ভবিষ্যতে পড়বো-পড়বো করছে—তার প্রতিটিরই আসন আর প্রার্থীর পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যেতে পারে। ব্যবধান এতেই বিপুল যে—তার উচ্চারণও অবিশ্বাস্য ঠেকবে। অবিশ্বাস্য হলেও তা বাস্তব, অতিরঞ্জিত নয়।

একই চিত্র বিদ্যালয়গুলোতে। এই জানুয়ারী এলেই স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ সীমা ছাড়িয়ে যায়—প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কোনও শ্রেণীতেই ভর্তি সহজ ব্যাপার নয়। অতি সম্প্রতি দশম শ্রেণীতে ভর্তি ও বদলি আদেশ দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শহরের ব্যর্থ পরীক্ষার্থীরা যেন বদলিপত্র নিয়ে শহরতলীতে অথবা অন্যত্র গিয়ে কারচুপির আশ্রয়ী হতে না পারে, বোধহয় সে কারণেই এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। কিন্তু এ ব্যাপারটিরও আর সব বিষয়ের মতোন দুটো দিকই আছে। এক দিকে হয়তো কারচুপি বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয়া হলো, অন্যদিকে সৃষ্টি হলো অচলতা। দশম শ্রেণীতে স্কুল পরিবর্তন কারও দরকার হবে না—এ কথা হলফ করে বলা যায় না। কিংবা সকল অভিভাবকই সরকারী চাকুরে নন যে প্রয়োজনে তার বা তাদের বদলি আদেশ নামার ছবি-কপি গেঁথে বোর্ড থেকে অনুমোদন আদায় করবেন। অভিভাবকদের গরিষ্ঠ অংশ বেসরকারী, সরকারী চাকুরে অথবা স্বাধীন পেশার যেমন ব্যবসা, আইন ব্যবসা অথবা অন্যান্য কিছু। এঁরা পেশাগত দিকে বদলি হন না বটে—কিন্তু স্থান পরিবর্তন তো করতে পারেন। বিশেষভাবে বাসা বদল তো হলে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোনও ভাড়াটে কোনও বাসায় দীর্ঘ স্থায়ী হতে পেরেছেন, এমন আষাঢ়ে গল্প কি কেউ শুনেছেন? বাসস্থানের নৈকট্য অভিভাবকের জন্য একটি বড় বিষয়—কেননা যানবাহন সমস্যা আজ আর নতুন তথ্য নয়। টাকের কড়ির জোর ছাড়াও প্রশ্ন আছে নিরাপত্তার। এ কারণেই অভিভাবক মাত্রই সাধ্যমাফিক চেষ্টা করেন সন্তানকে কাছে পিঠের বিদ্যাপীঠে নিয়ে আসার।

এসব কারণেই দশম শ্রেণীতে রদবদল রহিত করে নতুন করে সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন এবং যে মহৎ উদ্দেশ্যে এই নব-প্রথার প্রচলন, তা-ও বা কতোটা ফলপ্রসূ হতে পারবে এই সিস্টেমে, তা নিয়েও পর্যবেক্ষক মহল আশংকা প্রকাশ করছেন।

দশম শ্রেণীতে ভর্তি বা বদলি বন্ধ—এ তথ্য যদি শুধু সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না দিয়ে সংবাদপত্রেও পরিবেশিত হতো **সংবাদ হিসেবে**, তা হলে মনে হয় বিদ্যালয়গুলোর পিঠ বাঁচতো। বদলিচ্ছুদের পক্ষে এ তথ্য অনুধাবনই এখন দুঃসাধ্য। ফলে হাঙ্গামা বাধছে। ক্লেশ বাড়ছে, **কষ্ট হচ্ছে**।

এ এক বর্ণনাতীত পীড়ন। ছেলেমেয়েকে ভর্তি করতে না-পারা যেমন দুঃসহ বেদনাদায়ক তেমনি যন্ত্রণাকর ভর্তি প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেয়াও। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর সীট সংখ্যা যেমন সীমিত, তেমন সীমিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। ফলে নিদারুণ চাপ পড়ছে সীমিত প্রতিষ্ঠানের সীমিত সীটের ওপর। এর মধ্যে আবার আছে পরনো কাসুন্দি—সরকারী প্রতিষ্ঠানে সীট ও শিক্ষার্থী সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ও সুষম রাখার সুন্দর নীতি—আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাপ সৃষ্টির অব্যাহত রীতি। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এমন করুণ অবস্থায়ও সেখানে নিয়ম-নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে সহায়তা লাভ করেন। সরকারী নয় এমন প্রতিষ্ঠান কোনও অবস্থাতেই তা লাভ করেন না। ফলে এক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা এক একটি শাখায় প্রায় শ'তে গিয়ে পৌঁছে। মাত্র পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডে এর পরে কী করে পাঠের ন্যূনতম মান রাখা যায়?

রাখার প্রশ্ন যেন আর নেই। সরকারের হাতে গোনা ক'টি পুষ্ট প্রতিষ্ঠানের আভিজাত্য ও স্ট্যান্ডার্ড বজায়ের জন্য অলক্ষ্যে ব্যবস্থা করা হয় আর বাদবাকি সব ঠেলা হয় বিভিন্ন তথাকথিত বেনামী ও সম্বলহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। প্রশ্ন ওঠে—এতে কার লাভ হয়? না, লাভ তো হয়-ই-না, উল্টো শিক্ষার্থী দেশ ভবিষ্যৎ সকলি সংকটের মুখে পড়ে।

শিক্ষা তথা ভর্তির জন্য একালের সেরা উপাদান তদবির ও তারপরেই তকদির। মামা না থাকলে এতোকাল নাকি প্রতিষ্ঠাই হতো না—এখনকার নতুন সংযোজন—মামা ছাড়া স্কুল-কলেজের চেহারাও দেখা যায় না। ফলে একে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে নানাবিধ সংকট।

একালে তিনিই জনদরদী—যিনি জানুয়ারী মাসে ছেলেমেয়ে স্কুলে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতে সক্ষম। স্কুলে ভর্তি করিয়ে যিনি সুলভে ভালো কোচিংটিচার জুটিয়ে দিতে পারেন—তার যোগ্যতা আর এক ধাপ প্রমাণিত। এরও পরে আরও **বেসব কার্যপদ্ধতি** আছে, তা বহুল উচ্চারিত। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রেও আবির্ভূত ঘটছে দালাল বা টাউট শ্রেণীর।

শিক্ষার এই পরিণতি নিঃসন্দেহে **মর্মান্তিক**। শিক্ষা নিয়ে এমন নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রত্যেকে। তবু এর সুরাহা হতে পারছে না, দিনকে দিন নানাভাবে এ বাড়ছে। বেড়েই চলেছে। সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই শিক্ষা এখন অর্থের বিনিময়ে লভ্য হচ্ছে। সোজা পথেও প্রচুর ব্যয়ে গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট ব্যবস্থা ছাড়া ভালো করার পথ নেই এবং বাঁকা পথেও দ্বিগুণ পয়সা চাই। আরও বড় কথা। এই বঙ্কিম পথের অস্তিত্ব আছেই।

কালের কল্যাণে সোনাদানা হীরা জহরতের মতোন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তৈরি হয়েছে কালো পথ। কালো যতো কুশ্রীই হোক—নিরুপায় মানুষের কাছে সেই কালোই হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে শ্রেয় ও মহৎ।

বোধবুদ্ধি বিবেক থাকা সত্ত্বেও এই যে পতন, সে পতন আমাদের সকলের এবং ঘটছে সকলের সামনেই, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কি কোনও পথ নেই?

হোসনে আরা শাহেদ